দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীনিত্যানন্দের জীবনের প্রথমার্দ্ধ—জন্ম, সংসার ত্যাগ, পরিব্রাজন অবধূত জীবন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীনিত্যানন্দের জীবনের প্রথমার্দ্ধ — জন্ম, সংসার ত্যাগ, পরিব্রাজন অবধূত জীবন।

তিথি মাহাত্ম্য — আনন্দঘন অনিন্দ্যসুন্দর পুরুষ প্রবর শ্রীনিত্যানন্দ ১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে (১৩৯৫ শকাব্দ) শুভ মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে মর্ত্তভূমিতে আবির্ভূত হন। শ্রী ঈশান নাগরী বলেছেন —

"তেরশত পঁচানব্বই শকে মাঘ মাসে।
শুক্লা ত্রয়োদশীতে রাসের পরকাশে॥
ব্রজে বলরাম যেঁহ সেই নিত্যানন্দ।
অবতীর্ণা হৈলা বিতরিতে প্রেমানন্দ॥" [১]

এই শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিকে পবিত্র ব্রত হিসাবে প্রত্যেক বৈষ্ণবগণ গ্রহণ করেন। বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রীনিত্যানন্দ সার্বভৌমিক উপাস্য বলেই গ্রহণীয়। শুধুমাত্র বৈষ্ণবগণেরই নয়, তিনি সর্বসম্প্রদায়ের যুগধর্ম প্রচারক গুরু, উপাস্য ও পরিত্রাতা। তিনি সকলের প্রতি সমান দয়াপরবশ হয়ে সুপ্রচারিত যুগধর্ম হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে সকলকে সমান অধিকারী করেছেন। বিশ্বসংসার হয়েছে ধন্যাতিধন্য।

শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে শ্রীনৃসিংহদেব আবির্ভূত হয়ে চতুর্দশীর গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন। বামনাবতারে শুক্লা দ্বাদশী, রামাবতারে শুক্লা নবমী, কৃষ্ণাবতারে কৃষ্ণাষ্টমী বা জন্মাষ্টমী তিথি অবতারগণের আবির্ভাব তিথি রূপে শ্রেষ্ঠ, তেমনি কলিযুগে গৌরাবতারে ফাল্গুনী পূর্ণিমা ও নিত্যানন্দাবতারে মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিরও গৌরব হল। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তিথি মাহাত্ম্য উল্লেখ করে বলেছেন—

"নিত্যানন্দ জন্ম মাঘ শুক্লা ত্রয়োদশী।
গৌরচন্দ্র প্রকাশ ফাল্গুণ পৌর্ণমাসী॥
সর্বযাত্রা মঙ্গল এই দুই পুণ্যতিথি।
সর্বশুভ লগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি॥
এতেক এই দুই তিথি করিলে সেবন।
কৃষ্ণভক্তি হয় খণ্ডে অবিদ্যা বন্ধন॥

ঈশ্বরের জন্মতিথি যে হেন পবিত্র ।
বৈষ্ণবের সেইমত তিথির চরিত্র ॥" [২]

জন্মভূমি একচক্রাধাম — পুণ্যভূমি গৌড়বঙ্গেরই যে প্রান্ত থেকে একদিন এক মঙ্গলময় উৎসধারা নিখিল জগৎকে অহৈতুকী প্রেম ভক্তিরসে সিক্ত করেছিল, যাঁর প্রেমধারা আচণ্ডালে প্রবাহিত প্রাণবন্ত করে তুলেছিল, আত্মহননের পথ থেকে উদ্ধার করেছিল সমগ্র জাতিকে, এক অলৌকিক আত্মশক্তির মাধুর্য্যে সনাতন মত-পথকে রক্ষা করেছিলেন যিনি, সেই আত্মশক্তিতে শক্তিময় শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব বীরভূম জেলার অন্তর্গত একচক্রাধাম । শ্রীরামজন্মভূমি অযোধ্যা, শ্রীকৃষ্ণজন্মভূমি গোকুল এবং শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মভূমি নবদ্বীপ ধামের মতই ভক্তমণ্ডলীর কাছে একচক্রাধামও নিঃসন্দেহে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব তীর্থ ।

এই ধামের আরও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে । শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এবং শ্রীগৌরচন্দ্র — তিনজনেরই সঠিক জন্মস্থান নিয়ে মতদ্বৈধ আছে ।

শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পুরাণপুরুষ । তাঁদের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে বিতর্ক আছে । রামায়ণ মহাভারতের যুগ, — অযোধ্যার সত্যবদ্ধ রাজকুমার রামচন্দ্রের বনযাত্রা, সীতাহরণ, লঙ্কাসমর, রাবণবধ এবং মথুরার কারাগৃহে জাত বাসুদেবের কীর্ত্তিকথা, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ইত্যাদি বিষয় যে গ্রীক্ তথা পাশ্চাত্ত্য 'মিথ' ধারণার অঙ্গীভূত শিল্পসাহিত্যের শোভামাত্র নয়, — ত্রেতা, দ্বাপরাখ্য সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির ধর্ম্ম দর্শনের সমুচ্চ সঙ্কলন হয়েও শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ যে এখনও জ্ঞান-বিজ্ঞান সমৃদ্ধিত এই বিংশ শতকের অন্ত্যপাদেও হিন্দু তথা ভারতীয়দের নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাত্যহিক জীবনচর্চার অপরিহার্য অঙ্গ, সত্ত্বার নিবিড়তম বোধে ও বৌদ্ধিক বিচারে হৃদস্পন্দনের মতো জীবন্ত প্রত্যয়ে সুস্থিত জীবনসত্য তা সুনিশ্চিত । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন —
" রামায়ণ মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস ।"
বলেছেন, " ভারতবাসীর ঘরের লোক এই সত্য নহে, — রাম, লক্ষ্মণ সীতা তাদের মত সত্য ।" [৩]

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এখনও রামায়ণ মহাভারতের ঐতিহ্যলব্ধ কতগুলি স্থান—জন্ম-কর্ম-স্থান রূপে চিহ্নিত শত সহস্র বৎসর থেকে পুণ্য তীর্থরূপে স্বীকৃত। উত্তরকালে বহিরাগত ইসলাম ধর্মাবলম্বী সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণে এইসব বহু চিহ্নিত ধর্মস্থানের সৌধ বিচূর্ণ ও লুণ্ঠিত হয়েছে, এবং মন্দির মসজিদে রূপান্তরিত হয়েছে। বারাণসী, সোমনাথ প্রমুখ দেবস্থান ছাড়াও রামজন্মভূমি খ্যাত অযোধ্যা ও কৃষ্ণজন্মভূমিখ্যাত মথুরা স্থানও বিধ্বস্ত ও মসজিদে রূপান্তরিত বলে হিন্দুরা মনে করেন এবং পুনরুদ্ধারের দাবী যুদ্ধ পর্য্যায়ে প্রসারিত। রাজনৈতিক অধিকার প্রমত্ত দলীয় কূটকচাল ও সেই ধারাগুলির অনুমোদিত বুদ্ধিজীবিদের বিতর্কজাল সম্বন্ধে কোন মন্তব্য না করে -- এক্ষেত্রে এটুকুই বক্তব্য যে -- ঐতিহাসিক বিচারধারায় এখনও রামজন্মভূমি ও কৃষ্ণজন্মভূমি যথার্থ কোথায় তা সর্বসম্মত নয়, বিতর্কিত। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থানটি গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তনে নিশ্চিহ্ন। মায়াপুরই ঠিক সেইস্থান কি না এ নিয়ে মতানৈক্য আছে। কিন্তু শ্রীমন্নিত্যানন্দের জন্মস্থান একচক্রা সম্বন্ধে এই জাতীয় সংশয়ের অবকাশ নেই।

বহু বিচিত্র, এমন কি বিরোধী ধর্মাচার ও ভাবভাবনা জাত কুটিল স্রোতোবাহী ধারার পলিমাটী দিয়ে রচিত বীরভূমির একচক্রা গ্রামটির এবং সেখানকার 'সূতিকা মন্দির' টির ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক স্থিতি সুনিশ্চিত। কাজেই নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থানের সম্বন্ধে যে বিতর্ক ও অনিশ্চয়তা আছে, শ্রীনিত্যানন্দের জন্মক্ষেত্র সম্বন্ধে তা নেই।

শ্রীনিত্যানন্দের জন্মস্থান একচক্রাধাম বহু ঘটনা ও তাঁর স্মৃতিশালায় বিজড়িত। পৌরাণিক গ্রন্থোল্লেখিত কিংবদন্তী স্বরূপ এই একচক্রাগ্রাম আজও নিজস্ব ঐতিহ্য এবং প্রেমরসলীলা মাধুরীতে আপ্লুত হয়ে আছে।

একচক্রা নামে একটি গ্রামের কথা আছে মহাভারত আদি পর্বে বক পর্বাধ্যায়ে। জতুগৃহ থেকে পালিয়ে জননী কুন্তীকে নিয়ে পঞ্চপান্ডব ছদ্মবেশে নানা গ্রামে ঘুরছিলেন - এইসময়ে একচক্রাগ্রামে এসে এক বিপন্ন ব্রাহ্মণ পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা। শর্তমতো এই পরিবারের একজনের ভক্ষ্য হয়ে বকের কাছে

যাবার পালা শুনে কুন্তী ভীমসেনকে পাঠান এবং ভীমের হস্তে বক রাক্ষসের মৃত্যু হয়। শ্রীনিত্যানন্দের জন্মস্থান কী এই সুপ্রাচীন একচক্রা গ্রাম ?

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের একাদশ তরঙ্গে শ্রীনরহরি ঠাকুর একচক্রাগ্রামের ইতিবৃত্ত এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মুখে এইভাবে দিয়েছেন —

"একচক্রা গ্রাম নাম বহুকাল হৈতে।
বনবাসে পাণ্ডবাদি ছিলেন এথাতে ॥
এ প্রদেশে ছিল দুই রাক্ষস অসুর।
সে সভে পাণ্ডব পাঠাইলা যমপুর ॥
*** *** ***
একচক্রেশ্বর শিব পার্বতী সহিত।
নদী তীরস্থ প্রভাবাতি দেবাদি পূজিত ॥" [৪]

অতঃপর একাদশ তরঙ্গেই এক জ্যোতিষজ্ঞ শিরোমণির জবানীতে উক্ত হয়েছে —

"অযোধ্যা মথুরাদি ধামেতে ঈশ্বর।
বিলসয়ে এবে নহে প্রপঞ্চ গোচর ॥
এই একচক্রা হয় ঈশ্বরের ধাম।
এথা শীঘ্র প্রকটিব প্রভু বলরাম ॥

এই একাদশ তরঙ্গের-ই অন্যত্র আছে যে রাজা যুধিষ্ঠির যখন দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণসহ বনবাসে এসেছিলেন — তখন গৌড়দেশে একচক্রা গ্রামে এসে মুগ্ধ হলেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখে।

"দ্রৌপদী সহিত শ্রীপাণ্ডব পঞ্চভাই।
লোকহিতে রত যৈছে কহি সাধ্য নাই ॥
একচক্রা নির্জ্জনে রহয়ে মহানন্দে।
সদা সোভয়ে বলদেব কৃষ্ণচন্দ্রে ॥" [৪]

এই সাথে স্বপ্নচ্ছলে বলরাম যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন –

"এই কথোদূরে নবদ্বীপ নামে গ্রামে ।
সুরধনী বেষ্টিত পরম রম্যস্থানে ॥
কলির প্রথম কৃষ্ণ তথা বিপ্রকুলে ।
জন্মিব আচ্ছন্ন রূপে মহাকুতূহলে ॥
নানা দেশে জন্মিবেন প্রিয়গণ তাঁর ।
তাঁর ইচ্ছামতে জন্ম এথাই আমার ॥
এই একচক্রা মোর বিলাসের স্থান ।" [৪]

কিন্তু এ বিষয়ে বিতর্ক বিদ্যমান । 'বিশ্বকোষ গ্রন্থে' চীন পরিব্রাজকাদির সাক্ষ্যে এবং অন্যান্য বিষয়ে বলা হয়েছে যে, একচক্রার বর্ত্তমান নাম বিহারের আরা । "বর্ত্তমান কালে আরাতে একটি প্রবাদ আছে যে পঞ্চপাণ্ডব জননী কুন্তীসহ এই স্থানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন । এখানে বক রাক্ষসের বাসা ছিল । ভীম তাহাকে নিহত করেন । সুতরাং এই স্থানে মহাভারতের একচক্রা নগরী বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে ।

বর্ত্তমান আরার আর একটি প্রাচীন নাম চক্রপুর । ইহার পার্শ্বেই বকরি নামে ক্ষুদ্র গ্রাম আছে । এখানকার লোকের বিশ্বাস এই বকরী গ্রামে বক রাক্ষস বাস করিত ।" [৫]

কাজেই শ্রীনিত্যানন্দের জন্মভূমি একচক্রা (> একচাকা) গ্রামকে মহাভারতের একচক্রা বলে চিহ্নিত করা কতটা যুক্তিযুক্ত তা অবশ্যই ভাবা প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও স্মরণ রাখা উচিত । মহৎ চরিত্রকে আশ্রয় করে – তাঁর জন্ম কর্ম, বুদ্ধি ক্ষমতা প্রভৃতি সম্বন্ধে কালের ব্যবধানে নানা কাহিনী কিংবদন্তী সৃষ্টি হয় । এগুলি কাল প্রবাহে ও শ্রদ্ধাযুক্ত অনুশীলন মাধ্যম, বিশেষ করে যদি এই চরিত্র আধ্যাত্মিক জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব রূপে পরিচিত ও উত্তরকালে সমাদৃত হন, তবে তাঁর বিস্ময়কর নানা কর্ম বীজের অংকুরে বহু

কল্পবৃক্ষ ও নানা রং-রস-স্বাদের ফুল ফলের উদ্ভব হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। বীজরূপে অর্থাৎ গোড়াতে হয়ত ইহা মিথ্যা বা অমূলক নয়, কিন্তু মনুষ্য স্বভাবের অনুবর্তনে স্বাভাবিক ভাবেই প্রিয়বস্তু বা বিষয়ের প্রতি নিবিড় মমত্ব ও গভীর শ্রদ্ধাবশে ও মানুষের অন্তরের সহজাত কবিত্ব শক্তির মিশ্রণে এগুলি অনেক ক্ষেত্রে অতি কৃত বা অতিরঞ্জিত তথা ভাবসত্য ও শিল্পসত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত। এই ক্ষেত্রে প্রিয় ভাবনায় উদ্দীপিত শ্রদ্ধাশীল মানুষের হৃদয়াবেগ আতিশয্যের মধ্যে সমর্পিত হবার আশংকা সমধিক। কাজেই প্রবহমান জাতীয় ঐতিহ্য ও প্রত্যয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থেকেই, খোলা মন, সশ্রদ্ধ জাগ্রত বুদ্ধি, অনুকূল বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে যথাসাধ্য সত্য নির্দ্ধারণের প্রয়াস বাঞ্ছনীয়। প্রস্তাবিত সন্দর্ভে আমরা যথাসম্ভব এই উন্মুক্ত দৃষ্টির আলোকে ঘটনাবলীর তাৎপর্য বিশ্লেষণের চেষ্টা করব।

আনুমানিক পাঁচশত বৎসর পূর্বে বীরভূম জেলার অন্তর্গত এই একচক্রা-ধাম শস্যশ্যামল পরিপূর্ণ, জ্ঞানীগুণী, বিদ্বান-মনীষী-পরিবেষ্টিত প্রায় সকল বর্ণ ও শ্রেণীভুক্ত পুরবাসীর আনন্দময় ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে সমৃদ্ধ এক নগর ছিল। যাগ-যজ্ঞ, ব্রত-পূজা, অর্চনা হিন্দুর দশকর্মাদির অনুষ্ঠানে নগরটি সর্বদা জীবন্ত। এই গ্রামের একচক্রেশ্বর শিব-পার্বতীর বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে।

"পূর্বকালে এই গ্রামটি অত্যন্ত উন্নতিশীল ছিল এবং তথায় নানাপ্রকার সম্ভ্রান্ত লোক বাস করিত, সর্বদাই সংস্কৃতের চর্চা হইত। প্রবাদ আছে জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ পন্ডিত গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই একচাকা গ্রামে বলরামের অবতার হইবে, কিন্তু আমি অল্পায়ু:, আমার ভাগে তাঁহার দর্শন ঘটিবে না। ফলত: যথাসময়ে এই ভবিষ্যদ্বানী কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল।" ৬

পিতৃপুরুষ পরিচয় — 'শ্রীনিত্যানন্দ একচক্রাগ্রামে যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, সেরূপ ধর্মনিষ্ঠ পরিবার অতি বিরল । বস্তুত: বহুদিন পূর্বে এই পরিবারে যে ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, তা-ই যথাকালে ভক্তিমহাবৃক্ষ রূপে সংবর্ধিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শ্রীনিত্যানন্দের জীবনে ।

এই একচক্রা নগরেই শান্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ চতুর্বেদীর বংশসম্ভূত বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিধারী সুন্দরামল্ল নামে এক অতি ধর্মপরায়ণ কুলীন দম্পতি বাস করতেন । তাঁদের সংসার ছিল খুব সুখময় । বিভিন্ন ধর্মাচরণ এবং পরিবার বর্গাদির সাথে দেবদেবীর পূজার্চনাদির চর্চা থাকলেও ভাগ্যদেবীর নিষ্ঠুর পরিহাসে একে একে তাঁদের সবকয়টি সন্তানই ইহলোক ত্যাগ করেন । কিন্তু তৎসত্ত্বেও ধর্ম-পরায়ণ দম্পতির স্বধর্ম নিষ্ঠা ত্যাগ তো দূরের কথা, পক্ষান্তরে ক্রমশ: ঈশ্বর আরাধনায় তাঁদের আগ্রহ গভীর হতে গভীরতর হতে লাগল । অবশেষে তাঁদের আরাধনায় সন্তুষ্ট হরপার্বতীর প্রসাদে বেঁচে গেল একটি পুত্র সন্তান । মহাত্মা সুন্দরামল্ল অন্নপ্রাশন কালে পুত্রের নাম রাখলেন মুকুন্দ । যেহেতু তাঁর অন্যান্য পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেই মৃত্যুমুখে পতিত হত, এই কারণে শেষ পুত্রের ডাক নাম অতি খেদে রাখলেন হাড়ো । গ্রামে হাড়াই পন্ডিত নামেই পরিচিত ছিলেন । চলতি কথায় গ্রামস্থ লোক হাড়ো ওঝা বলত । 'ওঝা' শব্দটি উপাধ্যায় শব্দ থেকে আগত । এর অর্থ পন্ডিত ।

মুকুন্দ পিতামাতার স্নেহে তাঁর বাল্যকাল অতিক্রান্ত করলেন এবং অতি অল্পদিনেই তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে চমকিত করলেন সকলকে । সকলেই তাঁকে পান্ডিত্যের স্বীকৃতি দিলেন । পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে যথাকালে মুকুন্দ পন্ডিতের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হল ।

মৌড়েশ্বর গ্রামে রাজা মুকুট নারায়ণের কন্যা পদ্মাবতী দেবীর সঙ্গে তাঁর পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন হল । মুকুন্দ পন্ডিত ছিলেন পূত চরিত্রের মানুষ । পদ্মাবতী ছিলেন এক মহীয়সী সতী শিরোমণি মহিলা । কেবলমাত্র আপন পরিবারে

নয়, গ্রামের অন্যান্য পরিবারেও পদ্মাবতীর ছিল একটি বিশিষ্ট আসন। তাঁর স্বাভাবিক ঔদার্য্য, বিনয় ও সদ্‌গুণ কর্তৃক প্রতিবেশিগণের পরম প্রীতিভাজন হয়েছিলেন। তাঁদের পরিচয় সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীল কর্ণপুর লিখেছেন —

"রোহিণী বসুদেবৌ যৌ পিতরৌ রামকৃষ্ণয়োঃ
পদ্মাবতী মুকুন্দৌ তৌ সন্তৌ জাতৌ দ্বিজোত্তমৌ।
শ্রী সুমিত্রা দশরথৌ তাবপ্যবিশতামস ॥" [৭]

অর্থাৎ রামকৃষ্ণের পিতামাতা যে রোহিণী আর বসুদেব তাঁরা এক্ষণে দ্বিজকুলে মুকুন্দ আর পদ্মাবতী নামে জন্মগ্রহণ করেছেন। সুমিত্রা আর দশরথ তাঁদের মধ্যে প্রবেশ করেছেন।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী মহাশয় 'শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণ' গ্রন্থে বলেছেন, "মুকুন্দ পন্ডিত রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, তবে কৃষিকর্মও করিতেন। ব্রাহ্মণের কৃষিকর্ম করা তখন দোষের ছিল না। অনেক ব্রাহ্মণের তখন যজমান বৃত্তির সঙ্গে কৃষিকর্মও জীবিকা ছিল। চাকুরীজীবী ব্রাহ্মণ তখন অষ্টাদশ শতাব্দীতেও কম। ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে ইহার প্রচলন। ব্রাহ্মণের পক্ষে চাকুরী করা, বিশেষতঃ রাজসেবক, রাজার চাকুরী করা — ভাল কথা ছিল না। উহাতে নিন্দা ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাজ নন্দকুমারের মাতৃশ্রাদ্ধেও এমন ব্রাহ্মণ বাঙলায় ছিল — যাঁহারা আসেন নাই, খান নাই। কারণ তিনি নবাব মীরজাফরের চাকুরী করিতেন।" [৮]

জন্ম ও বাল্যকাল — মুকুন্দ পন্ডিত ও পদ্মাবতী দেবীর 'সাতটি পুত্রসন্তান' জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের নাম — কুবের, কৃষ্ণানন্দ, সর্বানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ, প্রেমানন্দ ও বিশ্বম্ভরানন্দ। [৯]
প্রথম পুত্র শ্রীমান কুবেরই পরবর্ত্তীকালে শ্রীনিত্যানন্দ নামে জগদ্বাসীর নিকট সুপরিচিত হয়েছিলেন। এই নামকরণ করেন তাঁর 'শ্রীগুরুদেব লক্ষ্মীপতি পুরী।' [১০]
খেলার সাথীদের কাছে ছিলেন চিদানন্দ। শ্রীযজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের মতে,

"প্রথমে নিতাইকে সকলে কুবের বলিয়া ডাকিত, তারপর অন্নারম্ভের পর হইতে রায় ও নিত্যানন্দ এই দুটি নামেই প্রায় সকলে তাঁহাকে ডাকিত।" [১১]

নিত্যানন্দ নামকরণ প্রসঙ্গে একটি কিম্বদন্তীমূলক তথ্য উল্লেখ করেছেন পন্ডিতপ্রবর দ্বিজপদ গোস্বামী। এই মতে নিত্যানন্দ নামকরণ প্রথম করেন ছদ্মবেশী গর্গ মুনি। "শ্রীনিত্যানন্দ যখন মাতা পদ্মাবতীর আটমাস গর্ভাবস্থায়, হঠাৎ তখন এক যোগীরাজ মুকুন্দ পন্ডিতের গৃহে আসিয়া মাতা পদ্মাবতীকে দর্শন করিয়া "এই গর্ভবাস" এই "গর্ভবাস" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রতিবেশীদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইলে, তিনি আরও বলিলেন যে, পদ্মাবতীর গর্ভে ব্রজের বলরাম আছেন। বলদেবের এইখানে গর্ভাবাস। তারপর তিনি 'গর্ভাবাস' 'গর্ভাবাস' মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী দিনে এই একচক্রায় তাঁহার আশু প্রকাশ — এবং 'নিত্যানন্দ' 'নিত্যানন্দ' বলিয়া বিহ্বলভাবে নৃত্য করিতে করিতে অন্তর্ধান করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ নামও তিনিই যোগীরাজের ছদ্মবেশে আসিয়া প্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন।" [১২]

শ্রীল ঈশান নাগর রচিত 'অদ্বৈত প্রকাশ' গ্রন্থে উল্লেখিত —

"ব্রজে বলরাম যেঁহ সেই নিত্যানন্দ।
অবতীর্ণ হৈলা বিতরিতে প্রেমানন্দ॥" [১৩]

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলেছেন —

"হাড়াই পন্ডিত নামে শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে পিতামাতা তানে করি পিতাব্যাজ॥
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা শ্রীবৈষ্ণব ধাম।
রাঢ় অবতীর্ণা হৈলা নিত্যানন্দ নাম॥" [১৪]

পুনশ্চ — "মাঘ মাসে শুক্লা ত্রয়োদশী শুভদিনে।
পদ্মাবতী গর্ভ একচাকা নামে গ্রামে॥
হাড়াই পন্ডিত নামে শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্বপিতা তানে করি পিতা ব্যাজ॥

কৃপাসিন্ধু ভক্তি দাতা শ্রীবৈষ্ণব-ধাম ।
অবতীর্ণ হৈলা ধরি নিত্যানন্দ নাম ॥" [১৫]

আনন্দের স্বভাবই হল নিত্য । আনন্দ মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণও নিত্য । তাঁর কথায় — প্রেমলীলা, কাব্য-গীতাদি যেথায় যাঁদের দ্বারা চর্চা হয়, সেই স্থান কাল-পাত্র সবই আনন্দময় হয় । আবার এই শ্রীকৃষ্ণ চিন্তাই যখন কারও দ্বারা গভীরভাবে বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে, উপলব্ধ হয়ে বিশেষ বিশেষ অকৃত্রিম, অপার্থিব দুর্লভ গুণাদি পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে আনন্দস্বরূপে নিত্য বিরাজ করে — তখন তারই বহিঃপ্রকাশের অপর এক নাম নিত্যানন্দ ।

শ্রীনিত্যানন্দের নামকরণের সার্থকতা পাওয়া যায় তাঁর জীবনব্যাপী কর্মধারার মধ্যে । প্রতি স্তরে আবির্ভাব লীলা থেকে অন্তর্ধান পর্যন্ত ।

"তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতাদের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না । কেবলমাত্র জানা যায় যে, তাঁহারা জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীনিত্যানন্দের গৃহত্যাগ ও মাতাপিতার লোকান্তরের পর একচক্রার বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বাঁড়র গ্রামে যাইয়া বসবাস করেন ।" [১৬]

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব সম্বন্ধে যে গভীর আলোচনা করেছেন, তার মর্মার্থ যথাস্থানে আলোচিত হবে, — কিন্তু রাম-লক্ষ্মণ, কৃষ্ণ-বলরাম, গৌর-নিতাই — এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের বিচিত্র সম্বন্ধ সূত্রটি কবিরাজ গোস্বামী যেভাবে উল্লেখ করেছেন, তা এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য —

নিত্যানন্দ স্বরূপ পূর্ণ হইলা লক্ষ্মণ ।
লঘু ভ্রাতা হৈয়া করে রামের সেবন ॥
রামের চরিত্র সব দুঃখের কারণ ।
স্বতন্ত্র লীলায় দুঃখ সহেন লক্ষ্মণ ॥
নিষেধ করিতে পারে যাতে ছোট ভাই ।
যৌন ধরি রহে লক্ষ্মণ মনে দুঃখ পাই ॥

কৃষ্ণাবতারে জ্যেষ্ঠ হৈল সেবার কারণ ।
কৃষ্ণকে করাইল নানা সুখ আস্বাদন ॥
রাম - লক্ষ্মণ কৃষ্ণ - রামের অংশ বিশেষ ।
অবতারকালে দোঁহে দোঁহাতে প্রবেশ ॥
সেই অংশ লঞা জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠাভিমান ।
অংশাংশ রূপে শাস্ত্র করয়ে ব্যাখ্যান ॥
শ্রীচৈতন্য সেই কৃষ্ণ নিত্যানন্দ রাম ।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম ॥ [১৭]

এক মহামাঙ্গল্যময় ক্ষণে অমৃতময় পুরুষ শ্রীনিত্যানন্দ মাতা পদ্মাবতী দেবীর অঙ্কদেশে আবির্ভূত হলেন । মাঘ মাস । নববসন্তের অগ্রদূত ঋতু । নিজেকে উৎসর্গ করে পৃথিবীর অন্নভান্ডারকে আনাজে - ফসলে পূর্ণ করে দিবার জন্য সে প্রস্তুত । তার ফুলের ডালিতে আছে ডালিয়া, গাঁদা, কুন্দ, নানা ধরণের মরসুমী ফুল, আছে আম্রমুকুলের সমারোহ, আর উৎসবের ডালিতে আছে নবান্ন উৎসব, লক্ষ্মী - সরস্বতী পূজা, মকর সংক্রান্তির পুণ্যস্নান । সর্বত্র একটি তৃপ্তি বিধায়ক আবহাওয়া ।

ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ণ উদয়ের প্রাক্কালে মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশীতে শ্রীনিত্যানন্দের উদয় যেন শুকতারার মতো শুভ বার্তাবাহী অন্ধকার মোচনের পূর্ব প্রতিশ্রুতি ।

বৈষ্ণবীয় ভক্তি-ভাবনায়, লীলারসের আশ্রয়ে শ্রীভগবানের নানা অবতারকে অবলম্বন করে যে সাহিত্য তথা পূর্বাপর সমন্বিত যে বিচিত্র আনন্দ-ধারা উদ্বেলিত হয়ে ওঠে তা ঐতিহাসিক স্থান কালের সৈকতসীমা অনায়াসে উল্লঙ্ঘন করে, চিত্তকে দিব্য ভাবের আনন্দে প্লাবিত করেছেন । শুধু বৈষ্ণবীয় কেন, ভক্তি-শাস্ত্রে, তথা সর্বদেশ ও কালের সর্বধর্মের ধারক বাহক প্রবক্তাদের দিব্য আবির্ভাব ক্ষণটি বাহ্যেন্দ্রিয় গ্রাহ্যতার বস্তু সর্বস্বতা অবদমিত ও নিরস্ত করে একটি অন্তরঙ্গ গভীর অতিলৌকিক অনুভবে উল্লসিত হয়ে ওঠে ; ভক্ত হৃদয়ে নতুন

সুর ঝঙ্কারে বেজে ওঠে। নিত্যানন্দের আবির্ভাবে, অদ্বৈতাচার্য্যের হৃদয়ে এমনি একটি আনন্দ উল্লাস বুঝি উচ্ছ্বসিত হয়েছিল, পদকর্ত্তা কৃষ্ণদাস চমৎকার বাণীবদ্ধ করেছেন —

"হাড়াই পন্ডিত অতি হরষিত
পুত্র-মহোৎসব করে।
ধরণী মন্ডল করে টলমল
আনন্দ নাহিক ধরে ॥
শান্তিপুর নাথ মনে হরষিত
করে কিছু অনুমান।
অন্তরে জানিলা বুঝি জনমিলা
কৃষ্ণের অগ্রজ রাম ॥
বৈষ্ণবের মন হৈল পরসন্ন
আনন্দ সাগরে ভাসে।
এ দীন পামর হইবে উদ্ধার
কহে দুঃখী দীনদাসে ॥" ১৮

শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবে একচক্রাতে বসে শ্রীনিত্যানন্দ এমনি সমুল্লসিত হুংকার দিয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন বৃন্দাবন দাস —

"যেদিন জন্মিলা নবদ্বীপে গৌরচন্দ।
রাঢ়ে থাকি হুংকার করিলা নিত্যানন্দ ॥
অনন্ত ব্রহ্মান্ড ব্যাপ্ত হইল হুংকারে।
মূর্চ্ছাগত হৈলা যেন সকল সংসারে ॥
কথো লোক বলিলেক — হৈল বজ্রপাত।
কথো লোক বলিলেক পরম উপাত ॥
কথো লোক বলিলেক জানিল কারণ।
গৌড়েশ্বর গোসাঞির হইল গর্জ্জন ॥

এইমত সর্ব্বলোক নানা কথা কয় ।
নিত্যানন্দে কেহ নাহি চিনিল সভায় ॥" [১৯]

পুত্রের আবির্ভাবে আনন্দিত মুকুন্দ পন্ডিত ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর অর্থ দান করলেন । পুত্রের অপরূপ রূপ দেখে আনন্দে বিহ্বল হলেন মাতা-পিতা । মুকুন্দ পন্ডিতের একটি অপরূপ পুত্র জন্মগ্রহণ করেছে এই সংবাদ ক্রমে গ্রামের সর্বত্র প্রচারিত হল । পুরুষ-নারী সকলেই এসে দর্শন করতে লাগলেন পন্ডিতের নবজাত শিশুকে । তাঁর রূপের আকর্ষণ ছিল বড় তীব্র । যিনি একবার তাঁকে দর্শন করেন, তাঁর আর ফিরে যেতে ইচ্ছে হয় না, বারে বারে দর্শন করতে ইচ্ছা করেন । তাঁর অপরূপ রূপলাবণ্য দেখে তিনি যে সামান্য মানব শিশু নন, কোন দিব্যপুরুষ এসে পন্ডিতের গৃহে জন্মগ্রহণ করেছেন, সকলেরই মনে এরূপ একটা ধারণা উদয় হল । সকলেই মুকুন্দ পন্ডিত এবং পদ্মাবতী দেবীর ভাগ্যের প্রশংসা করে বলতে থাকেন যে এই পুত্র তাঁদের তপস্যার একটি অদৃষ্টপূর্ব, অচিন্তিতপূর্ব্ব মহাসম্পদ । আত্মীয়স্বজন, গ্রামবাসী সকলেই এই দিব্য শিশুর জন্মোৎসবে মত্ত হয়ে উঠেন ।

মাতা-পিতার স্নেহে দিন দিন বেড়ে উঠতে লাগলেন নিত্যানন্দ । বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অঙ্গলাবণ্যও বৃদ্ধি পেতে লাগল । পদকর্তা শ্রীকৃষ্ণদাসের ভাষায় —

"ভুবন আনন্দ কন্দ বলরাম নিত্যানন্দ
অবতীর্ণ হইলা কলিকালে ।
ঘুচিল সকলদুখ দেখিয়া ও চাঁদমুখ,
ভাসে লোক আনন্দ হিল্লোলে ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ রায় ।
কণক চম্পক কাঁতি অঙ্গুলে যাঁদের ভাতি
রূপে জিতল কোটিকাম ॥
ও মুখমন্ডল দেখি, পূর্ণচন্দ্র কিসে লেখি,
দীঘল নয়ন ভাঙধনু ।

আজানুলম্বিত ভুজ, তনু থল পঙ্কজ
কটি ক্ষীণ করি অরি জনু ॥
চরণকমল তলে, ভকত ভ্রমর বুলে,
অধিবাসী অমিয়া প্রকাশ ।
ইহ কলিযুগ জীবে, উদ্ধার হৈল সবে,
কহে দুঃখী দীন কৃষ্ণদাস ॥" [২০]

শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর আদিখন্ডে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ২০৫ থেকে ৪৯৩ শ্লোক অর্থাৎ অধ্যায় শেষ পর্য্যন্ত ২৩৫টি শ্লোকে শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীগৌরাঙ্গ মিলন পূর্বজীবনের রূপরেখা দিয়েছেন । এই প্রামাণ্য সূত্র অনুসরণ করেই শ্রীনিত্যানন্দের একচক্রাবাসলীলা এবং অবধূত জীবনলীলা বর্ণনা করা হয়ে থাকে এবং এক্ষেত্রেও মুখ্যতঃ তাই করা হল ।

শিশু নিত্যানন্দ ক্রমে জানুর উপর ভর দিয়ে পরম সুন্দর হামাগুড়ি দেন । রোদন কাকে বলে জানেন না । যে একবার তাঁর হাস্যবদন দেখে সে আর ভুলতে পারে না । যে কোলে নিতে চায়, শিশু তারই কোলে যান, কে তাঁর মাতা, কে তাঁর পিতা জিজ্ঞাসা করলে পিতামাতাকে দেখিয়ে দেন । নিজের প্রতিবিম্ব দেখলে আলিঙ্গন করতে চান । শিশু নিত্যানন্দের সকলই অদ্ভুত । তাঁর কোন কার্য্যই সাধারণ বালকের মত নয় । খেলা করেন তাও অদ্ভুত । সমবয়স্ক বালকগণের সঙ্গে তাঁর খেলা যে দেখে, সেই বিস্মিত হয় । সকল ক্রীড়াই অপরাপর যুগের লীলার অনুকরণ । তিনি কখন ভূভার হরণ কখন দৈত্য দমন, কখন রাক্ষস সংহার প্রভৃতি বিবিধ লীলারই অনুকরণ করে থাকেন । শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের কিছু শ্লোক উদ্ধার করা যাক —

কোন শিশু সাজায়েন পুতনার রূপে ।
কেহ স্তন পান করে উঠে তার বুকে ॥
কোনদিন শিশুসঙ্গে নল খড়ি দিয়া ।
শকট গড়িয়া তাহা ফেলেন ভাঙ্গিয়া ॥

*** *** ***

কোনদিন শিশুসঙ্গে তালবনে যাইয়া ।
শিশুসঙ্গে তাল খায় ধেনুকে মারিয়া ।।
***　　　　***　　　　***
কোনদিন নিত্যানন্দ সেতুবন্ধ করে ।
বানরের রূপ সব শিশুগণে ধরে ।।
ভেরেন্ডার গাছ কাটি ফেলয়েন জলে ।
শিশুগণ খেলি জয় রঘুনাথ বলে ।। [২১]

প্রবীণ লোকেরা বালকের খেলা দেখে বিস্মিত হতেন । আবার যখন যা খেলা খেলতেন, শ্রীনিত্যানন্দ তখন সেই ভাবে আবিষ্ট হয়ে যেতেন, এমন কি সেই আদর্শ ও তা'তে কোন পার্থক্য থাকত না । যেদিন লক্ষ্মণের শক্তিশেল খেলা হয়, সেদিন ভীষণ এক বিপদ ঘটে । শ্রীনিত্যানন্দ ভেরেন্ডা বৃক্ষরূপ শেলের আঘাতে মূর্ছিত হলেন । সেই মূর্চ্ছা খেলার মূর্চ্ছা নয়, ভাবের মূর্চ্ছা । এই মূর্চ্ছা কিভাবে ভঙ্গ করতে হবে, বালকগণ ভুলে গেল । ক্রমে বালকগণের ছুটাছুটিতে শ্রীনিত্যানন্দের মূর্চ্ছার কথা জানাজানি হলে প্রবীণ ব্যক্তিগণ এলেন । পাগলের ন্যায় ক্রীড়াস্থলে উপস্থিত হলেন মুকুন্দ পন্ডিত ও পদ্মাবতী দেবী । 'মূর্চ্ছিত হইয়া দোঁহা পড়িলা ভূমিতে ।" এদিকে কত শত চেষ্টা করা হল, শ্রীনিত্যানন্দের মূর্চ্ছা আর ভঙ্গ হয় না । ক্রন্দনের রোল উঠল । এমন সময় তখন এক ব্যক্তি একটি বালককে ডেকে অভয় দিয়ে পূর্ব্বাপর কথা জিজ্ঞাসা করলেন । সেই বালক বলতে বলতে শ্রীনিত্যানন্দের শিক্ষা তাঁর স্মরণে এল । সে আনন্দে বলে উঠল, এক্ষণই সে নিত্যানন্দের মূর্চ্ছা ভাঙ্গাবে । তখন সেই বালক বীর হনুমান হয়ে গন্ধমাদন আনতে চলল । খেলার গন্ধমাদন আনীত হলে, তখন এক শিশু পূর্ব্ব শিক্ষানুসারে বৈদ্যরূপ ধারণ করে ঔষধ এনে নাসারন্ধ্রে ধরল, বহু চেষ্টা করেও যে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয় নি, সামান্য খেলায় সে মূর্চ্ছা ভেঙ্গে গেল । এভাবে বাল্যলীলা রসে বিস্ময়কর রহস্যময় ভাবী তাৎপর্যের ইঙ্গিতবাহী ক্রীড়া কৌতুকে একচক্রাবাসীদের মুগ্ধ ও প্রভাবিত করলেন শ্রীনিত্যানন্দ ।

শ্রীনিত্যানন্দ ছিলেন গ্রামের নয়নস্বরূপ । গ্রামবাসিগণ তাঁকে না দেখলে চতুর্দিক তাঁদের শূন্য বোধ হতো । পিতামাতার কাছে তিনি ছিলেন জীবন সর্বস্ব । পিতার সাথে কখনো চাষবাস দেখতে যেতেন মাঠে । আবার যজমানদের ঘরে পূজা অর্চনাও করতে যখন যেতেন মুকুন্দ পন্ডিত — তার-ও তল্পীবাহী অনুচর হতেন শ্রীনিত্যানন্দ ।

" তিলমাত্র নিত্যানন্দে না দেখিলে মাতা ।
যুগপ্রায় হেন বাসে ততোধিক পিতা ॥
তিলমাত্র নিত্যানন্দ পুত্রেরে ছাড়িয়া ।
কোথাও হাড়াই ওঝা না যায় চলিয়া ॥
কিবা কৃষিকার্য কিবা যজমান ঘরে ।
কিবা ঘাটে কিবা বাটে যত কর্ম্ম করে ॥
পাছে যদি নিত্যানন্দ চন্দ্র চলি যায় ।
তিলার্দ্ধে শতেকবার উলটিয়া চায় ॥ " ২২

শ্রীনিত্যানন্দের বিদ্যাশিক্ষা ও উপনয়ন সংস্কার সম্বন্ধে প্রাচীন পদে বিস্তৃত বিবরণ দুর্লভ । অবশ্যই ব্রাহ্মণ সন্তান যথাবিধি শাস্ত্রাদি পাঠ করেছিলেন এবং যথাবয়সে উপবীত ধারণ করেছিলেন । কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা জীবনের সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতাদি গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ আছে । শ্রীনিত্যানন্দ সম্বন্ধে সে তুলনায় একেবারেই কিছু নাই । মধ্যযুগে শ্রীনিত্যানন্দচরিতকে বিষয় করে যদি কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হোতো তবে অবশ্যই তা পাওয়া যেত, কিন্তু তেমন রচনা সম্ভব হয় নি । কারণ তত্ত্বতঃ গৌর নিতাই অভেদ হলে-ও রাম-লক্ষ্মণ, বলদেব-বাসুদেবের সাদৃশ্যে লক্ষ্মণ যেমন শ্রীরামের এবং বলভদ্র যেমন শ্রীকৃষ্ণের ছায়ার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছেন এবং প্রাসঙ্গিকভাবে লক্ষ্মণ ও বলদেব উল্লেখিত হলেও শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে মুখ্য চরিত্র করে রামায়ণ ও মহাকাব্য ভাগবতাদি রচিত হয়েছে — তেমনি মধ্যযুগের গ্রন্থকার, চরিতকারগণ শ্রীচৈতন্যের চরিতকথাই মুখ্য বিষয় করেছেন । কেবল অপরিহার্য্য প্রাসঙ্গিক চরিত্র রূপেই শ্রীনিত্যানন্দ ও

শ্রীঅদ্বৈতাদির কথা উল্লেখ করেছেন । অবশ্য তত্ত্বের ক্ষেত্রে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দের স্বরূপ ও সম্বন্ধ বিচারের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা নাই । শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের প্রথম দুটি মঙ্গলাচরণ সূত্রে এটি অপূর্বভাবে প্রকাশ করেছেন ।

"বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারান্ ।
তৎ প্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্ ॥"

বন্দনা করি শ্রীগুরুগণকে, ঈশ্বরের ভক্তবৃন্দ শ্রীবাসাদিকে, ঈশ্বরের অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে, ঈশ্বরের প্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দকে, ঈশ্বরের শক্তি শ্রীগদাধরকে আর শ্রীচৈতন্যাখ্য ঈশ্বরকে ।

"বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ সহোদিতৌ
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥" [২৩]

[গৌরদেশরূপ উদয় পর্বতে একই সঙ্গে সমুদিত অন্ধকার নাশক, পরম দয়াল দাতা আশ্চর্য পূর্ব ও পূর্ণ চন্দ্র তুল্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দকে বন্দনা করি ।]

কৃষ্ণ, গুরু, ভক্ত, শক্তি, অবতার প্রকাশ ।
কৃষ্ণ এই ছয় রূপ করেন বিলাস ॥
এই ছয় তত্ত্বের করি চরণ বন্দন ।
প্রথমে সামান্যে করি মঙ্গল চরণ ॥ [২৪]

*** *** ***

ব্রজে যে বিহরে পূর্বে কৃষ্ণ বলরাম ।
কোটি সূর্যচন্দ্র জিনি দোঁহার নিজ ধাম ॥
সেই দুই জগতেরে হইয়া সদয় ।
গৌড়দেশে পূর্ব শৈলে করিলা উদয় ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ ।

যাহার প্রকাশে সর্ব জগতে আনন্দ ।।
চন্দ্রসূর্য হতে যৈছে সব অন্ধকার ।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্মের প্রচার ।। [২৫]

তত্ত্বের বিচার রীতি ও কথাবস্তু তথা চরিতাখ্যানের পদ্ধতি আলাদা । এই হেতু শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র বিকাশের সঙ্গে সমন্বিত করে শ্রীনিত্যানন্দ আলোচনা-ই সঙ্গত সেইহেতু শ্রীনিত্যানন্দের বিবরণের জন্য প্রয়োজনে অন্যত্র সূত্র সাজিয়ে করতে হবে।

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে নিত্যানন্দের বিদ্যাচর্চা সম্বন্ধে একটি শ্লোকে বলা হয়েছে –

"অল্প দিবসেই কৈলা বিদ্যা উপার্জন ।
ব্যাকরণ আদি শাস্ত্র হৈলা বিচক্ষণ ।।" [২৬]

ব্রাহ্মণ সন্তানদের বিশেষত: যজমানী ও পৌরোহিত্য ব্যবসায়ী পরিবারে কিছুটা শাস্ত্রাদি পাঠের জন্য সংস্কৃত শিক্ষার অপরিহার্য্য প্রাথমিক প্রয়োজন ছিল । তারজন্য মুখ্য বিষয় ব্যাকরণ । এইসব শাস্ত্র অল্পদিবসেই অর্থাৎ দীর্ঘদিন না অভ্যাস করেই সহজ প্রতিভাবলেই অনায়াসে তিনি লিখেছিলেন । এই সময়ে শ্রীনিত্যানন্দের উপনয়নও হয়েছিল । সুন্দর স্বাস্থ্যবান বালকের উপনয়ন সংস্কারের কালে যে জ্যোতির্ময় ব্রহ্মচারীবেশে যে শোভা হয়েছিল – শ্রীনরহরি ঠাকুর একটি শ্লোকেই তা সুন্দর করে বলে দেন । –

"কি আনন্দ তাঁর যজ্ঞোপবীত সময় ।
যে শোভা দেখিল তা কহিলে না হয় ।।" [২৬]

হিসাবানুসারে বালকের বয়স দ্বাদশ বছর হলেও বিচার বুদ্ধির গভীরতা, দৈহিক সৌষ্ঠব এবং তাঁর আচার ব্যবহারাদি দেখে তাঁকে যুবক বলেই মনে হতো । সেই বয়সেই শ্রীনিত্যানন্দের বিবাহের কথা উঠেছিল । অনেকেই আপনাপন কন্যাকে শ্রীনিত্যানন্দকে অর্পণ করার জন্য মুকুন্দ পন্ডিতকে প্রস্তাব দিলেন। এই সংবাদে মাতা পদ্মাবতী দেবীরও পরমানন্দ । শ্রীনরহরি ঠাকুর ভক্তিরত্নাকর

গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন —

" নিতাইর বয়স হৈল দ্বাদশ বৎসর ।
ষোড়শ বর্ষের প্রায় দেখিতে সুন্দর ॥
বন্ধুজনে জানাইয়া হাড়াই পন্ডিত ।
পুত্রের বিবাহ দিতে হৈল উৎকন্ঠিত ॥
একচক্রাবাসী যত ব্রাহ্মণ সজ্জন ।
বিবাহ প্রসঙ্গে হর্ষ হৈলা সর্ব্বজন ॥ " ২৬

কিন্তু এই আনন্দ অচিরেই নিরানন্দে পরিণত হল । মুকুন্দ পন্ডিত এবং পদ্মাবতী দেবীর অভিলাষ সুসিদ্ধ হল না । তখন ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দ (১৪১০ শকাব্দ) । অগ্রহায়ণ মাসের শেষ । হঠাৎ একদিন এক অতি তেজস্বী নবীন সন্ন্যাসী মুকুন্দ পন্ডিতের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করলেন । পন্ডিত অতিথি সৎকার করলেন বিশেষ ভক্তি-সহকারে । সন্ন্যাসী পন্ডিতের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকথা আলোচনা করে পরমসুখে রাত্রি অতিবাহিত করলেন । প্রভাতে বিদায়কালে সন্ন্যাসী পন্ডিতের কাছে ভিক্ষা চাইলেন । তৎকালীন যুগে সাধু-বৈষ্ণব এসে কিছু যাঞ্চা করলে গৃহস্বামী কখনও তাঁদের বিমুখ করতেন না, হাসিমুখে তা দান করে নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করতেন । মুকুন্দ পন্ডিতও বললেন, " আপনার যাহা ইচ্ছা অসঙ্কোচে বলিতে পারেন । " " সন্ন্যাসী বললেন, - আমি তীর্থ পর্য্যটনে গমন করিতেছি । একটি ব্রাহ্মণ বালকের প্রয়োজন । তোমার এই জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে কিছুদিনের জন্য আমাকে দাও, আমি ইহাকে প্রাণাধিক স্নেহ করিব এবং নানা তীর্থ দর্শন করাইব । পন্ডিত বিষম ধর্ম-সঙ্কটে পতিত হইলেন । তিনি এই ধর্মসঙ্কটে যেন বিপথগামী না হন এজন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন —

' ধর্মসঙ্কটে কৃষ্ণ রক্ষা কর মোরে' ।

ভাবিতে ভাবিতে পুত্রকে প্রদান করাই স্থির করিলেন । এই বিষয়ে পত্নীর অভিমত জানিবার জন্য সন্ন্যাসীর অনুমতি লইয়া পদ্মাবতী দেবীর নিকট অন্তঃপুরে যাইয়া সকল কথা বলিলেন । পতিপ্রাণা পত্নী বলিলেন —

'তোমার যে কথা প্রভু সে কথা মোরে ।'

এইরূপ পিতামাতা না হইলে নিত্যানন্দের ন্যায় পুত্র জন্মেন না ।

হাড়াই পন্ডিত অম্লান বদনে অতিথিরে পুত্র দিলেন । অতিথি বিমুখ করিলেন না । পুত্রকে-ভিক্ষা ? যে পুত্র আবার প্রাণ হইতে প্রিয়তর —যে পুত্রকে তিলমাত্র চক্ষুর অন্তরাল করা যায় না, তাঁহাকে পিতা হইয়া বিলাইলেন, এ ধারণা বর্ত্তমান কালের লোকের না হইতে পারে, কিন্তু হাড়াই পন্ডিত প্রাণাধিক পুত্রকে যথার্থই বিলাইলেন ।" ২৭

সন্ন্যাসীও পন্ডিতের এইরূপ আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীনিত্যানন্দকে নিয়ে প্রস্থান করলেন ।

"হেন মতে দ্বাদশ বৎসর থাকি ঘরে ।
নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে ॥" ২৮

"সর্বদাই ব্রাহ্মণ চিন্তিত থাকিত, পাছে পুত্র সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগী হয় । — হইলও তাই ।" ৩০

তৎকালীন সামাজিক পরিবেশে নবীন বয়সে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্মে প্রবেশের প্রেরণা ও চেষ্টা খুব বিরল হলেও ছিল এবং তার জন্য নিয়ত উদ্বেগ থাকত বাবা-মায়ের মনে । এ ক্ষেত্রেও মুকুন্দ পন্ডিত এবং পদ্মাবতী দেবীরও ছিল ।

দ্বাদশ বৎসর পর্যন্ত বাল্যলীলারঙ্গে পিতৃমাতৃ গৃহে অবস্থান করে একচক্রাবাসীকে আনন্দ দান করেছিলেন বালক নিত্যানন্দ ।

"অনেকের ধারণা চৈতন্যদেবের বড় ভাই বিশ্বরূপ যখন সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করেন, তখন তিনিই বালক নিত্যানন্দকে সঙ্গে নিয়া যান । চৈতন্যের অগ্রজ বিশ্বরূপ এই সন্ন্যাসী । কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থে ইহার কোন প্রমাণ নাই । প্রমাণাভাবে ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না । যে সব উপগ্রন্থে ইহা আছে তাহা অপ্রামাণিক । ছাপার সমস্ত গ্রন্থই কিন্তু প্রামাণ্য নহে ।" ৩০

যে মুহূর্তে নিত্যানন্দ গৃহের বাইরে গেলেন, মুকুন্দ পন্ডিত মূর্ছিত হয়ে পড়লেন মাটীতে। পতিপ্রাণা পদ্মাবতী দেবী নিজের শোক সংবরণ করে নানা-ভাবে পতিকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হল। পুত্রশোকে বিহ্বল হয়ে অন্নজল পরিত্যাগ করলেন। তারপর পদ্মাবতী দেবীরও একই দশা হল। তাঁরা যতদিন ছিলেন, অর্ধ উন্মাদবৎ অবস্থায় ছিলেন। তাঁদের সহজ স্বাভাবিক জ্ঞান আর ফিরে এল না। শ্রীনিত্যানন্দ চিন্তাই তাঁদের ধ্যান ধারণা হয়েছিল, তাঁর চিন্তাতেই তাঁরা ডুবেছিলেন।

শ্রীল নরহরি ঠাকুর তাঁদের মর্মস্পর্শী ভাবাবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। —

"কোথা নিত্যানন্দ বলি ধূলায় লোটায়।
কি কহিতে কিবা কহে পাগলের প্রায়॥
ক্ষণে কহে নিত্যানন্দ হৈল অনেকক্ষণ।
আইস কোলে করি মোর জুড়াউক জীবন॥
ক্ষণে কহে মোর আগে চলহ হাঁটিয়া।
পাকিয়াছে ধান্য মাঠে চল দেখি গিয়া॥
ক্ষণে কহে চল বাপ হাটে শীঘ্র যাই।
যে ইচ্ছা তোমার তাহা কিনিব তথাই॥" ৩১

ভাবের আবেশেই তখন তাঁরা প্রতিক্ষণ শ্রীনিত্যানন্দের দেখা পেতেন। তাঁকে খাবার দিতেন, আদর করতেন, আবার কখনও কখনও ভাবের আবেশেই পুত্রকে হারিয়ে হা-হুতাশ করতেন। এভাবে অত্যল্পকালের মধ্যে উভয়েই ইহলোক ত্যাগ করলেন। শ্রীনিত্যানন্দের গৃহত্যাগ করবার সংবাদ পেয়ে একচক্রাবাসীরও মৃতপ্রায় অবস্থা হয়েছিল। 'মোরে কেনে সন্ন্যাসী না গেলেন লইয়া' — এই বলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিলাপ করতে লাগলেন। পিতামাতার লোকান্তরিত হওয়ার পর তাঁর অন্যান্য ভ্রাতাগণ একচক্রার বাস পরিত্যাগ করে বাঁড়র গ্রামে গিয়ে বসবাস করেন।

শ্রীনিত্যানন্দ যথারীতি সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করলেন। তিনি আর গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন না।

পরিব্রাজন ও অবধূত জীবন — শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দের অবধূত জীবনের প্রথমাংশ অর্থাৎ নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সঙ্গে মিলনের পূর্ব পর্যন্ত পরিব্রাজন বিষয় বর্ণনা করেছেন আদিখন্ডের ষষ্ঠ অধ্যায় এবং মধ্য খন্ডের তৃতীয় অধ্যায় যথাক্রমে ৩০৩-৪০৮ এবং ৬০ থেকে ১২২ অর্থাৎ ১০৫+ ৬২ = ১৬৭ পয়ার শ্লোকে । এ সম্বন্ধে অন্যান্য চৈতন্য-ভাষ্যকার বিশেষ কিছু লেখেন নি । ভক্তিরত্নাকরের বিবরণও সামান্য । কাজেই মূলতঃ শ্রীচৈতন্য ভাগবত অনুসরণে চৈতন্যমিলন পূর্ব শ্রীনিত্যানন্দের জীবন ও পরিব্রাজন আলোচনা সমুচিত ।

হেনমতে দ্বাদশ বৎসর থাকি ঘরে ।
নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে ॥
তীর্থযাত্রা করিলেন বিংশতি বৎসর ।
তবে শেষে আইলেন চৈতন্য গোচর ॥

(চৈ•ভা• ১।৬।৩০১-৩০২)

সন্ন্যাসী যখন হাড়াই পন্ডিতের কাছে শ্রীনিত্যানন্দকে প্রার্থনা করেন, তখন বলেছিলেন যে তীর্থ পর্য্যটনের জন্য একজন ব্রাহ্মণ সঙ্গী চাই । চিরকালের জন্য নয় 'কথোদিন লাগিদেহ' আর প্রাণ দিয়ে শ্রীনিত্যানন্দকে রক্ষা করবেন তিনি এবং "সর্ব তীর্থ দেখিবেন বিবিধ বিধানে ।" (চৈ•ভা• মধ্য। ৩। ৮৪)

কিন্তু তীর্থভ্রমণের সূচনাতেই শ্রীচৈতন্য ভাগবতের একটি শ্লোকে ভ্রমণ ব্যাপারে একটি সংশয়ের উদয় হয় ।

প্রথমে চলিলা প্রভু তীর্থ বক্রেশ্বর ।
তবে বৈদ্যনাথ বনে গেলা একেশ্বর ॥

(চৈ•ভা• ১।৬।৩০৭)

'একেশ্বর' কেন ? সন্ন্যাসী কি বক্রেশ্বর পর্য্যন্ত এসেই শ্রীনিত্যানন্দকে একা একা ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র গেলেন, অথবা দেহান্ত হল তাঁর ? কিম্বা নিজের ইচ্ছায়ই শ্রীনিত্যানন্দ সন্ন্যাসী সঙ্গ পরিত্যাগ করে একা একা চললেন ? শ্রীনিত্যানন্দ একাই পরিব্রাজন

করেছিলেন এটা যথার্থ বলে মনে করা যায় তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র বিচার করে। কিন্তু সে কি একটি তীর্থের - বক্রেশ্বরের পরেই, একা হয়েছিলেন তিনি ?

যাহোক একাই গেলেন বৈদ্যনাথ, সেখান থেকে গয়া হয়ে কাশী। তারপর

প্রয়াগে করিয়া মাঘমাসে প্রাতঃস্নান।
তবে মথুরায় গেলা পূর্ব জন্মস্থান ॥
(চৈ.ভা. ১।৬।৩১০)

মথুরা বলরাম অবতারে পূর্ব জন্মস্থান। কাজেই বেশ কিছুদিন থাকলেন সেখানে। যমুনা বিশ্রাম ঘাটে জলকেলি করলেন। গোবর্ধন পর্বতে উঠলেন, বৃন্দাবনাদি দ্বাদশ বনে ভ্রমণ করলেন। গোকুলে নন্দ:ভবন দেখে পূর্বস্মৃতি বশে কেঁদে আকুল হলেন। পরে মদনগোপালকে প্রণাম করে চললেন পান্ডবের পুরী হস্তিনার দিকে। এখানেও পূর্ব জন্ম স্মৃতিতে আবেগ তাড়িত হলেন শ্রীনিত্যানন্দ। কারণ হস্তিনা কেবল কুরুপান্ডবের নগরই নয়, এখানে হলধর বলরামের শৌর্যচিহ্নও নিখাত। জাম্ববতী নন্দন শাম্ব দুর্যোধন কন্যা লক্ষ্মণাকে হরণ করায় যাদব-কৌরবের মধ্যে যে বিরোধ হয়েছিল — তাতে হল দিয়ে হস্তিনাকে আকর্ষণ করেছিলেন বলদেব — 'ত্রাহি হলধর' বলে আর্তরব উঠেছিল।

হস্তিনা থেকে দ্বারকায় এসে সমুদ্রে স্নান করলেন আনন্দে, তারপর গেলেন সিন্ধপুরে। এটি পুরাণে কপিল মুনির জন্মভূমি। কর্দম ঋষির আশ্রম ছিল। (অতুল প্রসাদ গোস্বামী পাদের মতে বর্ত্তমান গুজরাট রাজ্যের সিট্‌পুর)। সেখান থেকে মৎস্য তীর্থে (মছনি পট্টম), সেখান থেকে শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী (বর্ত্তমান কাঞ্চীপুরম)। তারপর কুরুক্ষেত্র পৃথুদক তীর্থ — যেখানে বেননন্দন পৃথু শত অশ্বমেধ করেছিলেন। (বর্ত্তমান নাম পেহবা)। গেলেন বিন্দুসরোবর। এটি গুজরাটে কর্দম ঋষির আশ্রম। তারপর প্রভাস তীর্থে। তারপর সুদর্শন তীর্থ। এটি সোমনাথের কাছাকাছি। তারপর —

ত্রিতকূপ মহাতীর্থ গেলেন বিশালা ।
তবে ব্রহ্মতীর্থ চক্রতীর্থেরে চলিলা ॥
(চৈ·ভা· ১।৬।৩২৫)

ত্রিতকূপ – গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান মতে – "কোচিন রাজ্যের পশ্চিম উপকূলে ত্রিচুর বা তিরুশিবপুর নগর ।"
বিশালা – বৈষ্ণব তোষিনী মতে অবন্তী । কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান মতে, "সরস্বতী তীরবর্ত্তী বিশান নামতীর্থ, বদরিকাশ্রম ।" ব্রহ্মতীর্থ আজমীরের প্রসিদ্ধ পুষ্কর তীর্থ । চৈতন্য ভাগবতের বিখ্যাত টীকাকার অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী লিখেছেন – "চক্রতীর্থ অনেকগুলি । একটি প্রভাসে, একটি শ্রীক্ষেত্রে আর একটি ত্র্যম্বক নগর হইতে ৬ মাইল দূরে গোদাবরী তীরে । এটি কিন্তু উক্ত তিনটির একটিও নহে । এটি কুরুক্ষেত্র ।" [শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত শ্রীচৈতন্য ভাগবতের নিতাই করুণা কল্লোলিনী টীকা থেকে সংগৃহীত] ।

"তারপর প্রতিস্রোতা গেলা প্রভু প্রাচী সরস্বতী" (চৈ·ভা·১।৬।৩২২)

প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর মতে – "সরস্বতী নদী অনুলোম রূপে আসিতে আসিতে আবার যে স্থানে প্রতিলোম ভাব গমন করিয়াছেন । স্থানটি সম্ভবতঃ কুরুক্ষেত্রের সমীপে ।"
তারপর নৈমিষ অরণ্য এবং সেখান থেকে অযোধ্যা ।

"রাম জন্মভূমি দেখি কাঁদিলা বিস্তর ।" (চৈ·ভা·১।৬।৩২৩)

"তবে গেলা গুহক চণ্ডাল রাজ্য যথা ।
মহামূর্চ্ছা নিত্যানন্দ পাইলেন তথা ॥" (চৈ·ভা·১।৬।৩২৪)

গুহক চণ্ডাল রাজ্য সম্বন্ধে প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ লিখেছেন – "বর্ত্তমান চণ্ডালগড় বা চুনার । কেহ কেহ বলেন চুনার দেশের বিশুদ্ধ নাম চরণাদ্রি । মতান্তরে এলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত বাঁদা বা বান্দা গুহক চণ্ডাল রাজ্য । কাহারও কাহারও মতে শৃঙ্গেরের পুর । এলাহাবার জেলাস্থ আধুনিক শঙ্গরপুর ।"

তারপর সরযূ ও কৌশিকী (কুশী) নদীতে স্নান করে "গেলা পুনহ আশ্রম পুণ্যস্থান।" প্রভুপাদ অতুল কৃষ্ণ গোস্বামীর মতে "অপর নাম শালগ্রাম। ইহার-ই অতি নিকটে গণ্ডকী নদীর উৎপত্তি। * * * অপর নাম হরিক্ষেত্র।" তারপর গোমতী গণ্ডকী শোন তীর্থে স্নান করে উঠলেন মহেন্দ্র পর্বতের চূড়ায়। মহেন্দ্র পর্বত গঞ্জাম প্রদেশে সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী প্রসিদ্ধ পর্বত। এখন ইহাকে ইষ্টার্ণ ঘাট বা পূর্ব ঘাট বলে। (অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী)। তারপর হরিদ্বার। পরে —

পম্পা ভীমরথী গেলা সপ্ত গোদাবরী।
বেণুতীর্থে বিপাশায় মজ্জন আচরি॥ (চৈ·ভা·১।৬।৩৬০)

টীকাতে লেখা হয়েছে "পম্পা দাক্ষিণাত্যে বেল্লেরি জেলার বর্ত্তমান নাম হাম্পী।" ভীমরথী — এখন ভীমা নামে প্রসিদ্ধ। এই নদী দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। সপ্তগোদাবরী দাক্ষিণাত্যে গোদাবরী জেলার ছোলঙ্গীপুর স্থিত তীর্থস্থান। * * * মতান্তরে গোদাবরী সপ্তমুখের (মোহনায়) সঙ্গমস্থল। * * * গোদাবরীর সপ্তশাখা — যথা বাণগঙ্গা, ঊর্ধ্বা, পাণিগঙ্গা, মঞ্জিরা, পূর্ণা, ইন্দ্রবতী ও গোদাবরী। * * * বেন্না (বেনা, বেন্যা, বেণা) তীর্থ কৃষ্ণা ও বেন্নানদীর সঙ্গমস্থল। হায়দারাবাদ রাজ্যে। বিপাশা পাঞ্জাবের বিখ্যাত নদী।" (শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত শ্রীচৈতন্য ভাগবত নিতাইকরুণা কল্লোলিনী টীকা)

অতঃপর শ্রীনিত্যানন্দ কার্ত্তিকেয় দর্শন করে শ্রীপর্বতে গেলেন মহেশ পার্বতী দর্শন করতে।

তবে নিত্যানন্দ প্রভু দ্রাবিড় গেলেন॥
দেখিয়া বেঙ্কটনাথ কামকোষ্ঠী পুরী।
কাঞ্চীপুরী দেখি পুনঃ গেলেন কাবেরী॥
তবে গেলা শ্রীরঙ্গনাথের পুণ্যস্থান।
তবে করিলেন হরিক্ষেত্রের পয়ান॥
(চৈ·ভা· ১।৬।৩৩৬-৩৩৮)

"দ্রাবিড়- বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণে অবস্থিত। দ্রাবিড়, কর্নাট, গুর্জর, মহারাষ্ট্র ও

তৈলঙ্গ – এই পর্বতবিধ দ্রাবিড়। কলিঙ্গ দেশের দক্ষিণ সীমা হইতে কুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত দক্ষিণ ভারত।" বেঙ্কটনাথ – বেঙ্কটাচল। * * * কামকোষ্ঠী পুরী শ্রীশৈল ও দক্ষিণ মথুরার (বর্ত্তমান মাদুরা) মধ্যবর্ত্তী স্থান। * * * শ্রীরঙ্গনাথ – মাদ্রাজ প্রভিনসের অন্তর্গত ত্রিচিনোপলির উত্তরে সোধন্ যান্ (শ্রীরঙ্গম) নামে খ্যাত। * * * * হরিক্ষেত্র – বর্ত্তমান নাম হরিকান্তম পেন্নার। মাদ্রাজ প্রদেশে – * * পেন্নার নদীর তীরে।" (নিতাই করুণা কল্লোলিনী টীকা)

তারপর –

ঋষভ-পর্বত গেলা দক্ষিণ মথুরা।
কৃতমালা তাম্রপর্ণী যমুনা উত্তরা॥
মলয় পর্বত গেলা - অগস্ত্য আলয়॥

(চৈ•ভা• ১।৬।১৩৯-৪০)

ঋষভ পর্বত – দক্ষিণ প্রদেশে মাদুরা জেলার প্রান্ত সীমার একটি পর্বত। পর্বতটি এখন পালনি হিল্ নামে পরিচিত। দক্ষিণ মথুরা – এখন মদুরা বা মাদুরা নামে খ্যাত। * * * কৃতমালা – বর্ত্তমান নাম ভাইগা। (মতান্তর ভাগাই নদী) মাদুরা বা দক্ষিণ মথুরা এই নদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। * * * * তাম্রপর্ণী ভারতবর্ষের দক্ষিণ সীমায় মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কন্যাকুমারিকার নিকটে প্রবাহিত নদী। বর্ত্তমান নাম টিনিভেলি। * * * যমুনা- উত্তরা – এটি যমুনোত্রী কি ? যমুনোত্রী প্রাচীন কলিঙ্গ দেশ। এ স্থান হইতে যমুনা নদী নির্গতা হইয়াছেন। এ স্থানটি হিমালয় পর্বতের একাংশ। * * * মলয় পর্বত – মালাবার উপকূলের প্রসিদ্ধ গিরিমালার সর্বদক্ষিণ অংশ। বর্ত্তমান নাম ওয়েষ্টার্ণ ঘাট বা পশ্চিম ঘাট। এখানে অগস্ত্য মুনির আশ্রম। (নিতাই করুণা কল্লোলিনী টীকা)

তারপর নিত্যানন্দ গেলেন বদরিকাশ্রম। সেখানে কয়েকদিন থেকে গেলেন ব্যাসের আলয়। ব্যাসের আলয় এখন মানাল বা মনাল নামে খ্যাত। "তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন।" (চৈ•ভা•১।৬।৩৪৫) স্থান নামের অনুল্লেখে এটি কোথায় বুঝা যায় না।

তবে প্রভু আইলেন কন্যকা নগর ।
দুর্গাদেবী দেখি গেলা দক্ষিণ সাগর ॥
(চৈ·ভা·১।৬।৩৪৮)

কন্যকানগর – কুমারিকা অন্তরীপ বা কেপ কর্মায়ণ । দক্ষিণ সাগর – সেতুবন্ধ রামেশ্বরের নিকট মান্নার উপসাগর । (নিতাই করুণা কল্লোলিনী টীকা) তারপর গেলেন শ্রীঅনন্তপুর । এটি দাক্ষিণাত্য অনন্তপুর জেলা । ****ইহার অপর নাম ফাল্গুন । সেখান থেকে পঞ্চ অপ্সরা সরোবর । এটি সনাক্ত করা যায় নি । তারপর গোকর্ণ গিয়ে শিবদর্শন করলেন । "গোকর্ণ বর্ত্তমান নাম জেডিয়া । দাক্ষিণাত্য পশ্চিম সমুদ্র কূলে উত্তর ক্যানেয়া প্রদেশে ।" তারপর যান কেরল ও পরে ত্রিগর্ত্ত । "ত্রিগর্ত্ত বর্ত্তমান জলন্ধর প্রদেশ বা কাঙ্গড়া । মতান্তরে তিব্বত বা টিবেট । লাহোর জেলার কিয়দংশ জলন্ধর রাজ্য । ত্রিগর্ত্ত বলিতে বারি বিপাশা ও শতদ্রু বা সাটলেজ নদীদ্বারা প্লাবিত দেশ । মতান্তরে উত্তর কানারা ।" (নিতাই করুণা কল্লোলিনী টীকা)

তারপর –

দ্বৈপায়নী আর্য্যা দেখি নিত্যানন্দ রায় ।
নির্বিন্ধ্যা পয়োষ্ণী তাপী ভ্রমেণ লীলায় ॥
রেবা মহেশ্বরী পুরী মল্লতীর্থ গেলা ।
সূর্পারক দিয়া প্রভু প্রতীচী চলিলা ॥
(চৈ·ভা· ১।৬।৩৫১-৩৫২)

"দ্বৈপায়নী আর্য্যা – দাক্ষিণাত্যে গোকর্ণ তীর্থের সমীপে বোধ হয় । ***দ্বৈপায়নী শব্দের অর্থ দ্বীপ বাসিনী । আর্য্যা দেশের নাম নহে – দেবীর নাম । দেবীর নামেই দ্বীপটি প্রখ্যাত বোধ হয় । নির্বিন্ধ্যা – বিন্ধ্য পর্বত হইতে একটি ক্ষুদ্র নদী – চম্বলে আসিয়া পড়িয়াছে । পয়োষ্ণী দাক্ষিণাত্যে । কেহ কেহ বলেন যে বিন্ধ্য পাদ-পর্বতের (বর্ত্তমান নাম সাতপুরা রেঞ্জ) দক্ষিণে প্রবাহিতা নদী । তাপী বর্ত্তমান - তাপ্তী নদী । রেবা প্রসিদ্ধ নর্মদা নদী । মহেশ্বরী পুরী – রেবা বা নর্মদা নদীর তীরবর্ত্তী মহেশ্বরপুর । মল্লতীর্থ – এই স্থানটি রেবা বা নর্মদা

নদীর তীরবর্ত্তী মহেশ্বরী পুরী বা বর্ত্তমান মহেশ্বরপুর ও প্রভাসের মধ্যস্থলে হবে বোধ হয়।" [নিতাই করুণা কল্লোলিনী টীকা]

এখানে মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় শ্রীনিত্যানন্দের। খুব আনন্দ হয়।

নিত্যানন্দ বলে সবতীর্থ করিলাঙ্।
সম্যক্ তাহার ফল আজি পাইলায় ॥

(চৈ·ভা·১।৬।৩৬৭)

কতদিন শ্রীমাধবেন্দ্রের সঙ্গে ভক্তিরস আস্বাদন করে আনন্দে মগ্ন হয়ে রইলেন নিত্যানন্দ, পরে সেতুবন্ধের দিকে চললেন তিনি আর মাধবেন্দ্র গেলেন সরযূতীরে।

ধনুতীর্থে স্নান করি গেলা রামেশ্বর।
তবে প্রভু আইলেন বিজয়া নগর ॥

(চৈ·ভা·১।৬।৩৯৬)

"ধনুতীর্থ – বর্ত্তমান পল্বন প্যাসেজ ইণ্ডিয়া ও সিলোনের মধ্যবর্ত্তী। * * * অনেকেই বলেন যে বিদ্যানগর শব্দের অপভ্রংশই বিজয়া নগর। বিদ্যানগর তিনটি। একটি দাক্ষিণাত্যে তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে আনুগুণ্ডির দক্ষিণে, আর একটি গোদাবরী নদীর তীরে রাজমহেন্দ্রী; আর একটি মালোয়াদেশে সিন্ধ (সিন্ধু) এবং পারা (পার্বতী) নদীর সঙ্গমস্থলে। [নিতাই করুণা কল্লোলিনী টীকা]

তারপর মায়াপুরী অবন্তী গোদাবরী হয়ে জিওর নৃসিংহদেব পুরীতে এলেন শ্রীনিত্যানন্দ।

"মায়াপুরী বলিতে সময়ে সময়ে সমস্ত মায়াক্ষেত্র (কনখল, হরিদ্বার, হৃষিকেশ, তপোবন) বুঝায় এবং সময়ে সময়ে জ্বালাপুর, কনখল এবং হরিদ্বার এই তিনটি বুঝায়। অবন্তী মালব দেশের নাম। জিওড় দাক্ষিণাত্যে। এই স্থানটি কূর্মক্ষেত্র ও কাঞ্চীর মধ্যবর্ত্তী বোধ হয়। এই স্থানে নৃসিংহদেবের মন্দির আছে। [নিতাই করুণা কল্লোলিনী টীকা]

ত্রিমল্ল দেখিয়া কূর্মনাথ পুণ্যস্থান ।
শেষে নীলাচল চন্দ্র দেখিতে পয়ান ॥

(চৈ·ভা· ১।৬।৩৯৮)

"ত্রিমল্ল" - এখন তিরুমল্ল নামে খ্যাত । মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত প্রাচীন গ্রাম । তারপর কূর্মনাথ অর্থাৎ কর্মক্ষেত্র (এখন শ্রীকূর্ম্ নামেই খ্যাত ।) দেখে শ্রীনিত্যানন্দ গেলেন নীলাচল জগন্নাথ দর্শনে । কিছুদিন থেকে গঙ্গাসাগর এলেন । তারপর আবার ফিরে গেলেন মথুরায় । এইভাবে তীর্থ পর্যটন শেষ হল ।

আদি খন্ড ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ৮৩টি তীর্থ ভ্রমণের কথা আছে । আবার মধ্য খন্ড তৃতীয় অধ্যায় শ্রীনিত্যানন্দের আখ্যান আর একবার তীর্থ পরিব্রাজনের কথা বিবৃত করেছেন শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর । এই অধ্যায়ে ১০৭ থেকে ১১৪ পর্যন্ত সাতটি শ্লোকে সংক্ষেপে তীর্থগুলির তালিকা দেওয়া হয়েছে –

গয়া কাশী প্রয়াগ মথুরা দ্বারাবতী ।
নরনারায়ণাশ্রম গেলা মহামতি ।
বৌদ্ধালয় গিয়া গেলা ব্যাসের আলয় ।
রঙ্গনাথ সেতুবন্ধ গেলেন মালয় ॥
তবে অনন্তের পুরী গেলা মহাশয় ।
ভ্রমেন নির্জন বনে পরম নির্ভয় ॥
গোমতী গন্ডকী গেলা সরযূ কাবেরী ।
অযোধ্যা দন্ডকারণ্যে বুলেন বিহরি ॥
ত্রিমল্ল বেঙ্কটনাথ সপ্ত গোদাবরী ।
মহেশ্বরস্থান গেলা কন্যকা নগরী ॥
রেবা মাহিষ্মতী মল্লতীর্থ হরিদ্বার ।
যাঁহি পূর্বে অবতার হইলা গঙ্গার ॥
এইমত সর্বতীর্থ নিত্যানন্দ রায় ।
সব দেখি পুন আইলেন মথুরায় ॥

(চৈ·ভা·মধ্য। ৩। ১০৮ - ১১৪)

দেখা যায় যে, শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদি খন্ডে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে তীর্থ ভ্রমণ তালিকায় ৮৩টি স্থানের উল্লেখ আছে, মধ্যখন্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে আছে ২৭টি । এই দ্বিতীয় তালিকায় ৫৩টি নাম বাদ গেছে – যোগ হয়েছে একটি দন্ডক বন । যাহোক এই তীর্থ ভ্রমণের ক্রম পারম্পর্য, প্রাসঙ্গিকতা এবং শ্রীনিত্যানন্দ চরিত্রে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত বলরামের তীর্থ ভ্রমণের ছায়া ইত্যাদি বিশ্লেষণের পূর্বে ভারতীয় জীবন-ভাবনাতে তীর্থভ্রমণের গুরুত্ব – আবশ্যিকতা, বিধি-বিধানের দিকে একটু দৃষ্টিপাত প্রয়োজন ।

তীর্থ শব্দটি এসেছে তৃ ধাতু থেকে । যার অর্থ প্লবন, তরণ, অতিক্রমণ – অর্থাৎ প্রবন বেগে অতিক্রম করা । তার সঙ্গে করণে থ যোগ করা হয়, করণ অর্থ উপায় । কাজেই যা অতিক্রম করায় এবং প্রচন্ড শক্তি ও গতি সৃষ্টি করে তা তীর্থ । তীর্থ শব্দের বহু অর্থ থাকলেও মুখ্যার্থ – নিত্যকার তুচ্ছতা-ক্ষুদ্রতা, পাপ-ব্যাধিকে অতিক্রম করার করণ বা উপায় । দৈহিক স্বাস্থ্যের জন্য যেমন সাগর সৈকতে উন্মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ ও নির্মল জলে স্নানের জন্য যায় মানুষ, তেমনি যায় দেহ-মন-আত্মার সুস্থতার, ব্যাধি মুক্তির জন্য পুণ্যতীর্থস্থানে যার আকাশে, বাতাসে, মাটিতে, ধূলায়, জলে মিশে আছে অসংখ্য মহাত্মা-তপস্বী-সাধকের দুশ্চর তপস্যার দুর্লভ সিদ্ধির শাশ্বত আশীর্বাদ ও কল্যাণ কামনা । তীর্থস্থানে দেহের আবর্জনার মতো মনের আবর্জনাও কেটে যায় । আর তীর্থযাত্রী বিচিত্র মানুষের সঙ্গে মিশে তাদের বিশ্বাসের রসে নিজের বিশ্বাস-ও দৃঢ় হয়, আশ্বস্ত হয় । এইজন্য ভারতীয় চতুরাশ্রমের মধ্যে তৃতীয়াশ্রম বাণপ্রস্থে তীর্থ পরিক্রমা আবশ্যিক । গৃহস্থের-ও নানা তিথিতে অনুষ্ঠানে, উৎসবে, নৈমিত্তিক তীর্থ ভ্রমণ অপরিহার্য কর্তব্য । তীর্থ তিন প্রকার । স্থাবর, জঙ্গম ও মানসিক । কাশী-গয়া স্থাননিষ্ঠ স্থাবর তীর্থ । ব্রহ্মবিদ, ব্রাহ্মণ ও সাধুসন্তরা এক একজন মহাতীর্থ স্বরূপ – তাঁরা জঙ্গম – চলে বেড়ান । যেখানে যান সেখানেই পূর্ণজ্যোতি বিকীর্ণ করেন । আর মানস তীর্থ অর্থাৎ কতগুলি সদ্‌গুণ যা মানুষকে উন্নত করে ।

সত্যং তীর্থং ক্ষমা তীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ ।
সর্বভূত দয়া তীর্থং সর্বত্রার্জবমেব চ ॥

দান তীর্থং দমস্তীর্থং সন্তোষস্তীর্থমুচ্যতে ।
ব্রহ্মচর্যং পরং তীর্থং তীর্থঞ্চ প্রিয়বাদিতা ॥
জ্ঞানং তীর্থং ধৃতিস্তীর্থং পুণ্যং তীর্থমুদাহৃতম্ ।
তীর্থানামপি - তৎ তীর্থং বিশুদ্ধ মনস পরা ॥

সত্য, ক্ষমা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, সর্বভূতে দয়া, সর্বত্র সরলতা, দান, দম, সন্তোষ, ব্রহ্মচর্য, প্রিয়বাদিতা, জ্ঞান, ধৃতি, পুণ্য-— আর সর্বোপরি বিশুদ্ধ মন । বিভিন্ন পবিত্র স্থানে গমনে, স্নানে, দর্শনে, পূজনে, প্রার্থনার মধ্যে মানুষ সত্যাদি গুণ অর্জন করতে চায় — মানস তীর্থে নিত্য চর্চা করতে চায় । তারপর পুণ্যবান তাঁরা জ্ঞান তীর্থে পরিণতি লাভ করে । এইজন্য সাধারণ মানুষ থেকে লোকোত্তর মহাত্মারা-ও নৈমিত্তিক ও নিত্য তীর্থ সেবা করেন । প্রাচীন যুগে বৈদিক সমাজে ও সাহিত্যে পৌরাণিক যুগে রামায়ণ মহাভারতাদি তীর্থভ্রমণের কথা ও তীর্থ মাহাত্ম্য প্রভৃত আলোচনা হয়েছে এবং ভ্রমণ বিধি ব্যবস্থা-ও রচিত হয়েছে । হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রমুখ কেবল ভারতীয় ধর্মেই নয়, খৃষ্টধর্মে, ইসলামেও তীর্থ ভ্রমণ করা হয়। পরিব্রাজন ও তীর্থ পরিক্রমা বিশেষত: মানসিক ও আধ্যাত্মিক সমুন্নতির অপরিহার্য পন্থা । সাম্প্রতিক কালে স্বাস্থ্যের ততোধিক জ্ঞানার্জনের জন্য, শিক্ষার জন্য, আনন্দের জন্য যে পর্যটন ব্যবস্থা আছে তা-ও একই ভাব-ভাবনা থেকে অর্থাৎ ক্ষুদ্রতার পরিমার্জনা ও দেহমনে নতুন স্বাস্থ্য লাভের সম্ভাবনা জাত । যাহোক মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর তীর্থ পরিব্রাজন এই দিক থেকে-ও বিচার্য ও আস্বাদ্য ।

শ্রীমন্ নিত্যানন্দের ভ্রমণ স্থানের ক্রম বা পারম্পর্য সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে মনে নানা প্রশ্ন জাগে । ধারাবাহিকতা পদে পদে ক্ষুন্ন হয়, যেটা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের ভ্রমণ তালিকাতে কখনো দেখা যায় না । দাক্ষিণাত্যে বিষ্ণুকাঞ্চী থেকে কুরুক্ষেত্র যাওয়া, আবার প্রভাসে আসা, হরিদ্বার ও সপ্ত গোদাবরী পর পর যাওয়া কি সম্ভব ? আমরা তীর্থের তালিকার স্থান নামগুলি যথার্থ বিহিত করার জন্য বিভিন্ন টীকা মুখ্যত: শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ কৃত নিতাই করুণা কল্লোলিনী টীকার সাহায্য নিয়েছি, বিস্তৃত উল্লেখ দিয়েছি । মনে হয়েছে বৃন্দাবন দাস — নামগুলি গ্রহণ

করেছেন, কিন্তু ভ্রমণের পারম্পর্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। তাছাড়া আরও একটি গুরুতর কারণ আছে অনুমান করি।

নরহরি ভক্তিরত্নাকরে শ্রীনিত্যানন্দের তীর্থ পরিক্রমা সম্বন্ধে লিখেছেন —

দ্বাপরে করিলা যৈছে তীর্থ পর্যটন।
সেইরূপ সর্বতীর্থে করয়ে ভ্রমণ ॥ (৫।২২৬২)

অর্থাৎ শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত বলদেবের চরিত্রকে আদর্শ করে শ্রীনিত্যানন্দের চরিত্র রচনা করেছেন। কারণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণ বলরাম। তারও পূর্বে ত্রেতার শ্রীরাম লক্ষ্মণ-ই কলিযুগে নিমাই-নিতাই-রূপে অবতীর্ণ। ভ্রমণ-সূচীতে পারম্পর্য মূলক অনেকখানি বিভ্রাট মনে হয় এই মানসিকতা জাত।

শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে ৭৯তম অধ্যায়ে বলদেবের তীর্থ ভ্রমণ বর্ণিত হয়েছে। এখানে ভ্রমণপঞ্জী এই প্রকার — কৌশিকী, সরযূ, প্রয়াগ, পুলহাশ্রম, গোমতী, গণ্ডকী, বিপাশা, শোন, গয়া, গঙ্গাসাগর সঙ্গম, মহেন্দ্র পর্বত, সপ্ত গোদাবরী, বেণু, পম্পা, ভীমরথী, (কার্তিকেয় দর্শন) শ্রীশৈল, দ্রাবিড়, বেঙ্কট পর্বত, কামকোষ্ঠী, কাঞ্চীপুরী, কাবেরী, শ্রীরঙ্গ, হরিক্ষেত্র, ঋষভ পর্বত, দক্ষিণ মথুরা, সমুদ্র সেতু, কৃতমালা তাম্রপর্ণী, মলয়ে অগস্ত্যাশ্রম, দক্ষিণ সমুদ্র, কন্যাকুমারী, ফালগুণে পঞ্চাপ্সরা সরোবর, কেরল, ত্রিগর্ত, গোকর্ণ, আর্যা দ্বৈপায়ণী সূর্পারক, তাপী, পয়োষ্ণী, নির্বিন্ধ্যা, দণ্ডকারণ্য, মাহেশ্বরী পুরী, নর্মদা, মনুতীর্থ, প্রভাস — মোট ৪৫ টি স্থানে গিয়েছিলেন বলদেব। একটু লক্ষ্য করলেই বুঝা যায় এই থেকেই অনুসরণ করেছেন শ্রীবৃন্দাবন দাস। আক্ষরিক অনুবাদের চিহ্নও পরিষ্কার।

ততঃ ফালগুণমাসাদ্য পঞ্চাপ্সর সমুত্তমম্।
বিষ্ণু সন্নিহিতো যত্র স্নাত্বা স্পর্শদ্গয়াযুতম্ ॥
ততোদ্ভিব্রজ্যভগবান কেরলাংস্তু ত্রিগর্তকান্।
গোকর্ণাখ্যং শিবক্ষেত্রং সান্নিধ্যং যত্র ধূর্জটেঃ ॥

আর্য্যাং দ্বৈপায়ণী দৃষ্ট্বা শূর্পারকমগদ্বলঃ ।
তাপীং পয়োষ্ণীং নির্বিন্ধ্যামুপস্পৃশ্যাথ দণ্ডকম্ ॥
প্রবিশ্য রেবামগমদ্ যত্র মাহিষ্মতী পুরী ।
মনুতীর্থমুপাবশ্যে প্রভাসং পুনরাগমত ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৭৯।১৮-২১)

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে —

তবে নিত্যানন্দ গেলা শ্রীঅনন্তপুরে ।
তবে গেলা পঞ্চ-অপ্সরা সরোবরে ॥
গোকর্ণাখ্য গেলা প্রভু শিবের মন্দিরে ।
কুলাচল ত্রিগর্ত্তকে বুলে ঘরে ঘরে ॥
দ্বৈপায়ণী আর্য্যা দেখি নিত্যানন্দ রায় ।
নির্বিন্ধ্যা পয়োষ্ণী তাপী ভ্রমেণ লীলায় ॥
রেবা মহেশ্বরী পুরী মনুতীর্থে গেলা ।
সূর্পারক দিয়া প্রভু প্রতীচী চলিলা ॥

(চৈ.ভা.।১।৬।১৪৯-১৫২)

বলদেব ও শ্রীনিত্যানন্দের তীর্থ পরিক্রমার বহিরঙ্গ রূপরেখার যতই মিল থাক মূল উদ্দেশ্য ও চরিত্রগত যে বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে স্বাতন্ত্র্য — সেটি ত বৃন্দাবন দাস শ্রীনিত্যানন্দ চরিত্রে সুরক্ষিত করেছেন । কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ব্যাপারে বিরক্তি ও পরে সূত-বধ জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন বলদেব — কিন্তু অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ বেরিয়েছিলেন অভিজ্ঞতা-উপলব্ধি তথা নিজের জীবনের প্রস্তুতির জন্য শিক্ষার সন্ধানে । একটা মহত্তম লাভ হয়েছিল — মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গলাভ ।

আদি খন্ডের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ৩৫৩ শ্লোক থেকে ৩৯৪ পর্যন্ত ৪২টি পয়ার শ্লোকে এই মিলনটি অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর । সুর্পারক দিয়ে প্রতীচীর পথে যাত্রাকালে মাধবেন্দ্র পুরীর সাথে মিলন ঘটেছিল ।

শ্রীমন্ মাধবেন্দ্র পুরী দিবানিশি মত্ত থাকতেন শ্রীকৃষ্ণকথায়। নীলাকাশে মেঘরাশির আনাগোনা শুরু হলেই তাঁর হৃদয় কৃষ্ণস্মৃতি প্রেমরসের ধারায় রসাপ্লুত হয়ে নেচে উঠত, আর সেই রসধারায় শ্রীমন্ মাধবেন্দ্র পুরী বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে 'হা কৃষ্ণ ! হা কৃষ্ণ !' বলে ভূমিতে লুটিয়ে পড়তেন। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের ভাষায় —

মাধবেন্দ্র কথা অতি অদ্ভুত কথন।
মেঘ দেখিলেই মাত্র হয় অচেতন ॥

(চৈ·ভা·। ১। ৬। ৩৭৬)

শ্রীনিত্যানন্দ দক্ষিণ দেশে এসে এঁর সান্নিধ্যলাভ করেছিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ এবং মাধবেন্দ্র পুরীর সাক্ষাৎকারের শুরুতে বেশ কিছুদিন তাঁরা উভয়ে শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণলীলা-মাধুরী আলাপন করে সময় অতিবাহিত করতেন। কখনও কখনও তাঁদের উভয়ের নয়ন থেকে প্রেমাশ্রুধারা বইতে শুরু করত।

অহর্নিশ কৃষ্ণপ্রেমে মদ্যপের প্রায়।
হাসে কান্দে হৈহৈ করে হায় হায় ॥
নিত্যানন্দ মহামত্ত গোবিন্দের রসে।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে অট অট হাসে ॥
দোঁহার অদ্ভুত ভাব দেখি শিষ্যগণ।
নিরবধি হরি হরি করয়ে কীর্ত্তন ॥

(চৈ·ভা·। ১। ৬। ৩৭৭-৭৯)

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা শ্রীমন্ মাধবেন্দ্র পুরী শ্রীনিত্যানন্দের সাথে সখ্যভাবে মেলা-মেশা করলেও শ্রীনিত্যানন্দ তাঁকে সর্বদাই শ্রীগুরু রূপে মান্য করতেন।

এইমত মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দ প্রতি।
অহর্নিশ বলেন করেন রতি মতি ॥
মাধবেন্দ্র প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়।

গুরুবুদ্ধি ব্যতিরেক আর না করয় ॥
এইমত অন্যে অন্যে দুই মহামতি ।
কৃষ্ণপ্রেমে না জানেন কোথা দিবা রাতি ।"

(চৈ•ভা•। ১। ৬। ৩৮৮ - ৩৯০)

প্রবীণ কৃষ্ণপ্রেমী শ্রীমন্ মাধবেন্দ্র পুরী প্রত্যক্ষ করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দকে । মানসে তিনি শ্রীনিত্যানন্দকে এবং শ্রীকৃষ্ণকে অভিন্ন জ্ঞান করতেন ।

মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দে ছাড়িতে না পারে ।
নিরবধি নিত্যানন্দ সংহতি বিহরে ॥
মাধবেন্দ্র বলে প্রেম না দেখিলে কোথা ।
মোর সর্বতীর্থ হেন প্রেম যথা ॥
জানিলো কৃষ্ণের কৃপা আছে মোর প্রতি ।
নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইনু সংহতি ॥

(চৈ•ভা•। ১। ৬। ৩৮২ - ৩৮৪)

তিনি ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর দীর্ঘ পথ পরিক্রমা, বিশাল তীর্থরাজি দর্শন, স্পর্শনের যা কিছু সাক্ষাৎ ফল লাভ করেছেন, শ্রীকৃষ্ণের অকুণ্ঠ কৃপায় শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে তাঁর মিলন হয়ে তাঁর জীবন সার্থক হল ।

শ্রীমন্নিত্যানন্দের তীর্থ পরিব্রাজনের সার্থকতা ও মূল্যায়ন সম্বন্ধে বিদগ্ধ সমালোচক শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী মহাশয়ের উক্তি উল্লেখযোগ্য —

"২০ বৎসর ভারতের সকল তীর্থে ভ্রমণ ও বাস করিয়া অতিবাহিত করেন । ২০ বৎসর বাড়ী ফিরেন নাই । বিবাহ না করিয়া ২০ বৎসর একাদিক্রমে এই বৃহৎ দেশের তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া ৩২ বৎসর বয়সে তাঁহার জীবনে যে অভিজ্ঞতা, যে বহুদর্শিতা, যে উদারতা সঞ্চিত হইয়াছিল — নবদ্বীপের কোন এক বিশেষ সংকীর্ণ টোলে, কোন এক বিশেষ শাস্ত্র এতদিন ধরিয়া পড়িলে, বুদ্ধি ও চরিত্র যেরূপ গঠিত হইত, নিত্যানন্দ চরিত্রে তাহা হয় নাই । বহু বৎসর ব্যাপী

বহুদেশ ভ্রমণজনিত নিত্যানন্দচরিত্রে কূপমন্ডুকতা বাল্য হইতেই প্রশ্রয় পায় নাই । - - - - নিত্যানন্দ টোলে পড়েন নাই, পড়ান নাই, বিদ্যা ও পান্ডিত্যের খ্যাতি নাই, সুযোগও ঘটে নাই । কিন্তু তিনি বহুদর্শী, তিনি একজন ইতিহাস-বরেণ্য বিখ্যাত ভ্রমণকারী পরিব্রাজক । ভারত-পর্য্যটকদের মধ্যে, ষোড়শ কেন, অদ্যাপি তিনি অগ্রণী । মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে এত বড় পর্য্যটক ও বহুদর্শী আর কেহই ছিলেন না । - - - - নিত্যানন্দ উদার, ক্ষমাশীল, অবধূত অর্থাৎ সর্ব-সংস্কারমুক্ত এবং পরম দয়াল । নিত্যানন্দ প্রভু দেশ বেশী দেখিয়াছেন, মানুষ বেশী চিনিয়াছেন । সমস্ত ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর লোককে ২০ বৎসর একাদি-ক্রমে যিনি একটা উদ্দেশ্য লইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহার মানসিক বিকাশ ও পরিণতির ইতিহাস বাঙলা সাহিত্যে আজিও লিখিত হয় নাই । অপ্রাকৃতের মোহে পড়িয়া বৈষ্ণব লেখকগণ এই অতি বড় প্রয়োজনীয় প্রাকৃতের ইতিহাসটি উপেক্ষাই করিয়াছেন । নিত্যানন্দের ২০ বৎসরব্যাপী ভারত ভ্রমণ এক নিঃশ্বাসে, প্রাচীন পুঁথির এক পাতাতেই নিঃশেষ হইয়া যায় । কিন্তু তা যাওয়া উচিত নয় ।" ৩২

অধিকন্তু শ্রীনিত্যানন্দ কেবলমাত্র পর্যটন-দর্শনাদি-ই করেন নি, নির্জনেও মাঝে মাঝে বাস করেছেন ।

"কথদিন নরনারায়ণের আশ্রমে ।
আছিলেন নিত্যানন্দ পরম নির্জ্জনে ॥" ৩৩

"তিনি অবধূত, যোগী । তাঁহার দেশভ্রমণ একটা বিলাস নয়, খেয়াল নয়, বায়ু পরিবর্তন নয়, উদ্দেশ্যহীনও নয় । বাঙলার ষোড়শ শতাব্দীর ধর্মপ্রচারের যে প্রকান্ড মহীরুহ, তাহা এই সময়ে বীজ হইতে তাঁহার মধ্যে অঙ্কুরিত হইতেছিল ।" ৩৪

তথ্য সূত্র

১। অদ্বৈত প্রকাশ — শ্রীল ঈশান নাগর। ১৪৯০ শকাব্দ। ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দ শ্রীশ্রীনাথ গোস্বামী কর্তৃক সংশোধিত। ১৪ অধ্যায়। পৃঃ ৫৭।

২। শ্রীচৈতন্য ভাগবত — শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর। আদি। ৩য় অধ্যায়।

৩। লোক সাহিত্য - রামায়ণ - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪। ভক্তি-রত্নাকর — শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর। ১১ তরঙ্গ।

৫। বিশ্বকোষ — শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় সংকলিত। ১২৯৩ সাল।

৬। নিত্যানন্দ চরিত — শ্রীযজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। ১৩১৫ খ্রীঃ।

৭। গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা — কবি কর্ণপুর।

৮। শ্রীনিত্যানন্দ ও তাঁর পার্ষদগণ — শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী। পৃঃ ৬৮।

৯। শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত — শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর। (কিশোরীদাস বাবাজী সম্পাদিত) পৃঃ ৩।

১০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলা — প্রভুপাদ শ্রীহরিদাস গোস্বামী। ৯ অধ্যায়। পৃঃ ৪৩৪।

১১। শ্রীনিত্যানন্দ চরিত — শ্রীযজ্ঞেশ্বর চট্টপাধ্যায়। ১৩১৫ খ্রীঃ।

১২। বৈষ্ণব জগতের মাধুকরী — ২য় খন্ড। শ্রীরবীন্দ্র রাহা। পৃঃ ২৭৫।

১৩। অদ্বৈত প্রকাশ — ঈশান নাগর। ১৪ অধ্যায়। পৃঃ ৫৭।

১৪। শ্রীচৈতন্য ভাগবত — শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর। আদি খন্ড। ২। ৩৫-৩৬।

১৫। তদেব। আদি। ২। ১২৫-১২৭।

১৬। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর — শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী। আদি লীলা। পৃঃ ৭৮।

১৭। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত - শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। আদি লীলা। ৫ম পরিচ্ছেদ। ১২৮-১৩৪।

১৮। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর – শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী ।

১৯। শ্রীচৈতন্য ভাগবত – শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর । আদি খন্ড। ৬ষ্ঠ অধ্যায় । ২০৯-২১৩ ।

২০। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর – শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী ।

২১। শ্রীচৈতন্য ভাগবত – শ্রীল বৃন্দাবন দাস । আদি খন্ড । ৬ষ্ঠ অধ্যায় ।

২২। তদেব । মধ্য খন্ড। ৩ অধ্যায় । ৭০-৭৩ শ্লোক ।

২৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত - শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ । আদিলীলা । ১ম পরিচ্ছেদ । শ্লোক ১।২ ।

২৪। তদেব । আদি । ১ পরিচ্ছেদ । শ্লোক ১৫-১৬ ।

২৫। তদেব । আদি । ১ পরিচ্ছেদ । শ্লোক ৪৫-৪৮ ।

২৬। ভক্তিরত্নাকর – নরহরি দাস ঠাকুর । ১১ তরঙ্গ ।

২৭। বিশ্বকোষ ।

২৮। শ্রীচৈতন্য ভাগবত – শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর । ১।৮

২৯। মহাপ্রভু ও তাঁর পার্ষদগণ । শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী । পৃ: ৬৯ ।

৩০। তদেব ।

৩১। ভক্তিরত্নাকর – শ্রীল নরহরি ঠাকুর । ১১ তরঙ্গ । পৃ: ৪৫০ ।

৩২। শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণ – শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ।

৩৩। শ্রীচৈতন্য ভাগবত – শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর । ১।৬।৩৪২ ।

৩৪। শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণ – শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী ।